আবদুর রউফ চৌধুরী

আমার নাম রূপমিয়া, রূপ না থাকলেও কেউ কোনওদিন আপত্তি তুলেনি ।

হিথরো বিমানবন্দরে অবতরণের জন্য যখন পি.আই.এ. এরোপ্লেন চক্কর দিচ্ছে, তখন আমি প্রথমবারের মত দেখলাম– আলোর তরঙ্গে সজ্জিত লন্ডন নগরকে, যেন স্বপ্নের শহর; তারকারাজি যেমন আকাশকে সাজিয়ে সুন্দর করে তুলে আলোর মালা পরিয়ে, তেমনি মনে হচ্ছে; এ-যেন আলোর শহর, বিয়েবাড়ি যেন, শুধু বরের আগমনের প্রতিক্ষায় আছে, বরেরও মন জুড়ে কত কল্পনা থাকে, বাস্তবের সঙ্গে মিলে কী না এ-নিয়ে ওর ভাবনা নেই, তবে নিছক কল্পনার মধ্যেও আনন্দ থাকে । প্লেনটি রানওয়ের একপ্রান্তে এসে থামলে, সেফ্‌টি ব্যাল্ট খুলে সহজ হয়ে বসতেই, আমার দৃষ্টি বাইরে গেল– গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, শিশিরের মত উড়োজাহাজের ডানায় এসে ভিড় জমাচ্ছে বিন্দু বিন্দু হয়ে, তবে টিকে থাকতে পারছে না, পিছলে পড়ে যাচ্ছে; তখনই ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন, 'রাত আটটা, লন্ডন টাইম, বুধবার, ১০ই জানুয়ারী ১৯৬২ সাল ।'

সঙ্গের সকলপ্রকার কাগজ সঠিক থাকায়, নির্ঝঞ্ঝাটে পাসপোর্ট চেকপয়েন্ট অতিক্রম করে পা ফেললাম কাস্টমস চেকপয়েন্টে; সঙ্গে তেমন মালপত্র নেই, তাই এখানেও দেরি হল না; সকল নিয়মকানুন পালন করে কাস্টমস চেকপয়েন্ট পেরিয়ে আসতে তেমন সময়ই লাগল না । মনে কোনও অস্বস্তি নেই, কেউ ত আর আমার জন্য অপেক্ষা করছে না, লন্ডন পৌঁছানোর দিন-তারিখ-সময় কারওকে জানাইনি, জানালে অবশ্য পরিচিত দু-একটি মুখের সন্ধান পাওয়া যেত; নিজগ্রামের বেশ ক'জন লন্ডনি আছেন বিলেতে, মাসখানেক আগে আমিই ত দু'জনকে করাচি বিমানবন্দরে পি.আই.এ. প্লেনে তুলে দিয়েছিলাম, ছোটমামাও এখানে থাকেন, ঠিকানা অবশ্য সঙ্গে এনেছি, রেখেছি বুকপকেটে । এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের বিশাল চত্বরে নাকানি-চুবোনি খেয়ে অবশেষে বেরিয়ে এলাম যাত্রীদের অনুসরণ করে একটি খোলা মাঠে । রাত সাড়ে ন'টা । গা কেমন যেন করছে; অপ্রত্যাশিত বৃষ্টিভেজা শীতল একটি ঝাপটা বাতাস এসে আঘাত করল পাঁজরে । যাত্রীর দল একে একে অভ্যর্থনাকারীর গাড়িতে উঠে অদৃশ্য হতে লাগল, শুধু আমি একা দাঁড়িয়ে আছি, বুঝতে পারলাম, কারওকে না-জানিয়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে এমনি হাড়কাঁপুনি শীতরাতে এসে হাজির হওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই; এর জন্য কী দায়ী আমার পরনির্ভরশীল না-হওয়ার যে-সংকল্প ছোটবেলা থেকে অন্তরে পোষণ করে আসছি তা; আত্মবিশ্বাস থাকা ভালো, কিন্তু অধিক থাকা অমঙ্গলই; তবে ঘাতপ্রতিঘাতে আত্মীয়স্বজনের কাছে সাহায্যের আবেদন প্রত্যাখান হওয়ার ফলে আমার হৃদয়ে যে-অভিমান সৃষ্টি হয়েছিল তা-কী এখনও ক্ষুব্ধভাবে দানা বেঁধে আছে! এমন সময় আমার

ভাবনায় যতি টেনে সামনে এসে দাঁড়াল এক ট্যাক্সি ড্রাইভার, সে লক্ষ করেছে আমার অসহায় অবস্থা, তাই প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাবেন?' উত্তরে পকেটে রাখা ছোটমামার ঠিকানাটি বের করে তার সামনে তুলে ধরতেই সে কয়েক সেকেন্ড চোখ বুলিয়ে বুঝে নিল যে, আমি এদেশে নতুন এসেছি; তারপর ট্যাক্সির দরজা খুলে বলল, 'ঢুকে পড়ুন।' গরম কাপড়ের স্বল্পতা ও শৈত্যের তীব্রতা– দু'কারণেই আমার শরীর বরফপিণ্ড, এ-অবস্থায় ড্রাইভারের আহ্বানে আমি ট্যাক্সিতে প্রবেশ না-করে কী করতে পারি! ট্যাক্সিতে প্রবেশ করে স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেললাম; গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ বলেই হয়ত আমরা ইব্রাহীম নবীর অগ্নিকুণ্ড, সীতাদেবীর চিতার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারি, কিন্তু ঠাণ্ডায় ফ্রিজ হয়ে জীব যে পাথরে পরিণত হতে পারে এ-ভাবনা আমাদের মাথায় সহজে ঢুকে না, নতুবা বরফকুণ্ডঠাণ্ডা নরকের কথা শুনলে অনেক বেশি ভয় পেতাম।

ড্রাইভার দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে করকাপাত মানে 'স্লিট' উপেক্ষা করে; তার মত দীর্ঘবাহুর ইংরেজ করাচিতে অনেক দেখেছি, উচ্চতায় পাকিস্তান-প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে ছাড়িয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে, পাকিস্তান বিমান-বাহিনীতে ইংরেজ-জাতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ না পেলে হয়ত তার সাহচর্যে, এই জনহীন প্রান্তরে, স্বস্তি পেতাম না। তার গায়ে লম্বা ওভারকোট, কম্বলের মত পুরু ও মাওলানার আলখাল্লার চেয়ে লম্বা; হাতে গ্লাভস; মাথায় ফারের টুপি; এত কাপড় গায়ে জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও, আমি হলে, এরকম শীতে ঠকঠক করে কাঁপতাম, কঠোর ঠাণ্ডায় দাঁত কটমট করত। তার শাদা ধবধবে দাঁতগুলি পাশে রাখা কালো রঙের ট্যাক্সির ওপর পড়তেই বেশ উজ্জ্বল দেখাল; একইসঙ্গে মনে হল, সে কেন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে? ভিতরে প্রবেশ করে ট্যাক্সি স্টার্ট দিয়ে আমাকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিলেই ত তার রক্ষা! হাইড শহরটি কোনদিকে? কতদূর? ইংল্যান্ডের অনেক অঞ্চলের নাম শুনেনি, কিন্তু হাইড বলে ত কোনও শহরের নাম আমার জানা নেই। রাজধানীর আশপাশে ছোট একটি শহর হবে নিশ্চয়। অন্যথায় সে কী আমাকে তার ট্যাক্সিতে তুলত!

ট্যাক্সিটি উষ্ণ থাকায় আমার শরীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। ড্রাইভারও তার নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে, ট্যাক্সি চালু করার চেষ্টা করছে, কিন্তু হচ্ছে না, ঠাণ্ডায় এঞ্জিন জমে গেছে। এখন কী হবে? আরে, এত সহজে ঘাবড়িয়ে গেলে চলবে না। জোরে জোরে সাহস মনফানুসে পাম্প করতে লাগলাম, ড্রাইভারও ট্যাক্সি চালু করার চেষ্টা করতে লাগল, কয়েকবার চেষ্টার পর হঠাৎ এঞ্জিন স্টার্ট হল, বিকট শব্দে, কেঁপে কেঁপে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, সে আমাকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে না, গাড়িটি শুধু একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ভেবে পেলাম না তার আসল মতলবটি কী? ট্যাক্সির উত্তাপে শরীর গরম হওয়ায় মনে যে প্রফুল্লতা এসেছিল তা এখন উবে যাচ্ছে। শুকনো স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কতক্ষণে, তুমি মনে কর, আমরা হাইড শহরে পৌঁছে যাব?'

সে সামনের দিকে তাকিয়ে, মন্থরগতিতে ট্যাক্সি চালানো অবস্থায়, ডান-হাত হুইলে রেখে ও বাঁ-হাতে উইন্ড-স্ক্রিন মুছতে মুছতে বলল, 'তোমার দেওয়া ঠিকানায় দেখলাম হাইডের সঙ্গে চেশায়ার শব্দটি যুক্ত আছে। এতে মনে হচ্ছে, চেশায়ারের অন্তর্গত কোনও একটি টাউন হবে।' ড্রাইভিং-মিররে আমাকে আরেকবার দেখে নিয়ে আস্তেধীরে যোগ করল, 'শায়ার বলতে এ-দেশে একটি অঞ্চলকে বোঝায়। একটি শায়ারে কয়েকটি শহর বা বন্দর থাকে। আমি অবশ্য একবার চেশায়ারের স্টক্‌পোর্ট গিয়েছিলাম। হাইড যদি তেমনি একটি চেশায়ারের অন্তর্গত শহর হয়...।' মনে মনে কী যেন ভেবে নিয়ে যোগ করল, 'সম্ভবত তাই হবে। তাহলে...।' সে বাক্যটি শেষ করল না, বরং কোমর ঘুরিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে, মুখ ঝুঁকিয়ে, নরমস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কাছে কত পাউন্ড আছে?'

আমার কাছে যা আছে তা যদি সে নিয়ে যায়, তবে আমি যে অসহায় অবস্থায় পড়ে যাব, মামার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমার হাতে কিছু-না-কিছু পাউন্ড থাকা বাঞ্ছনীয়, এই ত আমার একমাত্র সম্বল, কাজেই সম্পূর্ণ হাতছাড়া করা অনুচিত; একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললাম, 'দশ পাউন্ড।'

সে নিরাশ হয়ে ছুঁচোর ন্যায় মুখ করে মন্তব্য করল, 'যদি আমার জানা স্টক্‌পোর্টের কাছে তোমার হাইড শহরটি হয়, তাহলে এ-দিয়ে পেট্রোল-খরচই হবে না।' তারপর কী যেন ভেবে নিয়ে যোগ করল, 'তাই ত খুঁজছি অন্য যাত্রীদের সন্ধান। আরও দু'জন যাত্রী পেয়ে গেলে তোমাকে নিয়ে যেতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না, কিন্তু পাচ্ছি না তো।'

আমি নিশ্চুপ। সে মুচকি হেসে বলল, 'জানি তোমার কাছে এর চেয়ে বেশি পাউন্ড থাকবে না।' ভীষণ অবাক, বললাম, 'কী করে জানলে?'

'অনেক ইন্ডিয়ানের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। তোমরা এ-দেশে আস খালি হাতে, কিন্তু দু'বছর যেতে-না-যেতে হয়ে যাও বড়লোক। তোমার অবশ্য আরেকটি বাড়তি সুবিধে আছে।' ড্রাইভারের চোখ বড় হয়ে উঠেছে, একইসঙ্গে ঘনভাবে নিশ্বাস পড়তে লাগল। তারপর সে বলল, 'কাজেই তোমার উন্নতি ঠেকাবে কে?'

'অতিরিক্ত সুবিধে মানে, বুঝতে পারলাম না।'

'তুমি ইংরেজি জান। লিখতে পার তো?'

'মুটোমুটি।'

'আর কী চাও? একেবারে সোনায় সোহাগা! এখন তোমার দশ পাউন্ডের নোটটি আমাকে দিয়ে দাও।'

মুখ নীচু করে বসে আছি, কিছুই বলতে পারছি না, যক্ষের ধন দশ-পাউন্ডটি মানিব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে না যেন। সে আমার ইতস্ততভাব লক্ষ করে, সম্ভবত আমাকে নিশ্চিত করার জন্যে, বলল, 'হাইড শহরটি অনেক দূরে। সেখানে ট্যাক্সি ভাড়া করে একা গেলে পোষোবে না। তোমাকে নিয়ে যেতে হবে ইউস্টোন রেলস্টেশনে। বিমানবন্দর ইনার লন্ডন থেকে বেশ বাইরে ও দূরে। রেলস্টেশনগুলি শহরের একেবারে মধ্যখানে। লন্ডন বেশ বড় শহর কী না, তাই রেলস্টেশনের সংখ্যাও অনেক, কমপক্ষে সাতটি। ভাগ্য ভালো হলে প্রথমে যে-স্টেশনে যাব সেখানেই পেয়ে যেতে পারি হাইড শহরের সন্ধান, নতুবা বেশ ঘোরাঘুরি করতে হবে। যা-ই হোক, আমি তোমাকে ঠকাবো না, বরং তোমার একটি ব্যবস্থা করে দেওয়ার চেষ্টা করব।'

সে হাসল, মোলায়েম হাসি, ঠোঁটের কোণ ছেয়ে গেল হাসির আভায়, যা ছড়িয়ে পড়ল তার চোখেমুখে। সে দশ-পাউন্ডের নোটটি তার পকেটে পুরে সোজা হয়ে বসে ট্যাক্সি চালাতে শুরু করল। মোটরযানের গতিবেগের সঙ্গে গন্তব্যস্থানে পৌঁছনোর অনিশ্চিয়তায় আমার হৃদয়াবেগ বেড়ে গেল। শীতের রাত, রাস্তার আলো-অন্ধকার আমার সর্বাঙ্গে এসে বিঁধতে লাগল, অন্তর্মুখী মনোকাননকে বহিঃদেশে প্রসারিত করতেই দৃষ্টিনন্দন চারদিকের দৃশ্যাবলী অবলোকন করতে শুরু করেছে, যতই দেখছি ততই অন্তর পুলকিত, আর পরিবেশ ঝাপসা আলোর মেলায় আপ্লুত; প্রকৃতিকে পরাজিত করার কী অপরূপ খেলা! শ্বেতাঙ্গ নরনারী, মাঝেমধ্যে হুরপরীরা একজন আদমকে ঘিরে খেলা শুরু করেছে, এদের সৃষ্টিতে স্রষ্টার নৈপুণ্য প্রকাশ পাচ্ছে সর্বাধিক, কেমনভাবে বিচরণ করছে তারা লন্ডনের নন্দনকাননে। স্টেশনে পৌঁছতেই ট্যাক্সিচালক বলল, 'তুমি ট্যাক্সিতে বস, আমি দেখি তোমার জন্য একটা টিকেটের ব্যবস্থা করতে পারি কী না!'

ট্যাক্সির দরজা ঠাস্ করে বন্ধ করে দিয়ে ক্ষণিকের মধ্যে ড্রাইভার অদৃশ্য হয়ে গেল। ট্যাক্সির ভিতরে বসা আমি যেন নিশ্চল পাথরের মূর্তি, শুধু চোখ-দুটো জানালার কাচকে ভেদ করে বাইরের জনপদ দেখতে ব্যস্ত, যেমনি শুভ্রসুন্দর মানুষগুলি তেমনি তাদের আবাসভূমিও; স্রষ্টার করুণার প্রকৃষ্ট নিদর্শন যেন। ইংরেজ-জাতির রাজত্বে একসময় সূর্য অস্ত যেত না, শৌর্যবীর্যসমৃদ্ধ ইংরেজ-জাতি ভারতবর্ষকে শাসনশোষণ করেছে প্রায় দুশো বছর, সেই ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে আজও কী ইংরেজের আধিপত্য থেকে মুক্তি পেয়েছে ভারতবর্ষীয়রা? প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্তা শক্তির কুদরতের শান যেন! তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনওকিছুই ঘটতে পারে না! অসামঞ্জস্যের সমষ্টি যেন এই শক্তি ক্ষুধার্ত মানুষকে বঞ্চিত করে অসাম্য, শোষণ, বঞ্চনার নিয়ম তৈরি করে চলেছেন।

গোরা ফিরে এসে বলল, 'ইয়াংম্যান।' সঙ্গে সঙ্গে আমার ধ্যান ভেঙে গেল। তার দিকে তাকাতেই সে স্মিতমুখে বলল, 'হাইড বলে ইংল্যান্ডে কোনও রেলস্টেশন নেই।' আমার মুখ শুকিয়ে গেছে দেখে সে যোগ করল, 'কোথাও নিশ্চয় হাইডিং করে আছে, খুঁজে বের করতে হবে বই কী!' আমার বুকের ভিতরে ধড়াস করে শব্দ উঠল। আবারও আমার মুখ দেখে নিয়ে সে বলল, 'ভেবো না, তোমার একটা ব্যবস্থা না-করে আমি যাচ্ছি না।'

আমি নিশ্চুপ।

আমার নীরবতা ভাঙার জন্যে সে ঠাট্টা করে বলল, 'তোমাকে ত আবর্জনার মত রাস্তার পাশে ফেলে দিতে পারি না! তবে মনে রেখো, এ-দেশের কিছু লোক ভিনদেশীকে তা-ই মনে করে। আর সেরকম ভাবা তাদের জন্য তেমন অন্যায়ও না। তুমি অন্যের জীবন-জীবিকার ওপর ভাগ বসাতে চাইলে সে ত তার মনের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেই। এই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা কী মস্তবড় অপরাধ?'

বাইরের ঠাণ্ডাহাওয়া যেন কাচ ভেদ করে আমাকে সফেদমূর্তিতে পরিণত করল, আমার মুখ যেন শাদা কাফন। আমার অবস্থা চট করে একবার দেখে নিয়ে ড্রাইভার বলল, 'তোমার কথা আলাদা, বিপদে পতিত প্রাণীকে সাহায্য করা একজন মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। তবে মুশকিল হচ্ছে, হাইড পৌঁছতে কোন রেলস্টেশনে যেতে হবে তা টিকেট-কাউন্টারের লোকদের জানা নেই। এখন সেই তথ্য খোঁজার জন্য আমাকে যেতে হবে ইনকুয়্যারি অফিসে। সেখানে কতক্ষণ লাগবে, কে জানে! তোমাকে বলে যেতে এসেছি যে, আমার দেরি হলে তুমি দুশ্চিন্তা করো না।'

সে আবার নিরুদ্দেশ হল। নিজেকে সামলে দিলাম, ঠোঁট কামড়ে তার যাওয়ার পথপানে তাকিয়ে ভাবতে বসলাম, শীতবাতাসে আমাকে যখন পাচ্ছে না, তখন গদি-আঁটা আসনে, ট্যাক্সির ভিতরে বসে ঘাবড়ানোর কী কিছু থাকতে পারে! তবে গোরার কোনও কোনও কথা আমাকে নীরবে পীড়া দিতে লাগল। বারকয়েক এপাশ ওপাশ করে, হঠাৎ হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে, দু'হাতের ওপর শরীরের ভর রেখে চিন্তা করতে লাগলাম, বিরক্তি আর বিস্ময়বোধ এক হয়ে মাথার মধ্যে উদয় হল কিঞ্চিৎ দার্শনিক ভাবনার, ভারতবর্ষের মানুষ একটি ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারল না, প্রাণীই থেকে গেল, তবে গোরা ভুলে গিয়েছে তার বাপ-দাদার কথা– তারা জীবিকার অন্বেষণে জোঁকের মত বাঙালির রক্ত চুষে খেয়েছে। শোষণ করেছে সভ্য একটি জাতিকে অমানুষের মত। সাধারণ লোক ত আর টের পায় না যখন জোঁকে তাকে ধরে তখন, জোঁক যখন তার কাজ সেরে শরীর বেয়ে নীচে নেমে পড়ে তখনই মানুষ টের পায়, সেসময় জোঁককে কিছু করার আর থাকে না, বরং রক্তপাত বন্ধ করার জন্যে চুনছাই লেপে দেওয়া ছাড়া অন্যকোনও উপায় থাকে না। ইংরেজ-জাতি কিন্তু জোঁকের চেয়েও চালাক, রক্তপানেই সে ক্ষান্ত হয় না, রক্তঝরানোর ব্যবস্থাও করে রাখে, খুন যাতে ঝরতে পারে আজীবন সে লক্ষ্যে তারা ভারতবর্ষকে ভাগবিভাগ করেছে, পাশ্চাত্যনির্ভর করে রাখার উত্তম ব্যবস্থাই যেন। ভারতবর্ষের মানুষদের ইংল্যান্ডে আসার কারণটি অন্যরকম, জোঁক হয়ে ত বিলেতে আসেনি, এসেছে সেবক হয়ে, গোরার গায়ের ঘাম মুছে দিতে, এতে তাদের খুশি না হওয়ার কোনও কারণ-অকারণ দেখি না। যাক্‌গে, ড্রাইভার ত আর খারাপ লোক নয়, সে তার সময় নষ্ট করে আমার উপকার করার চেষ্টা করছে। ক'জন স্বদেশী এরকম কাজ করবে? সর্বজনীন শিক্ষার ফলে হয়ত গোরারা মানবতার দিকে অগ্রসর হয়েছে।

ড্রাইভার ফিরে এসে তার ওষ্ঠাধরে ধরে রাখা হাসিটিকে সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে ট্যাক্সির দরজা খুলে বলল, 'এবার তুমি নেমে যেতে পারো। হাইড যাওয়ার জন্যে তোমাকে ম্যানচেস্টার নামতে হবে। ম্যানচেস্টার অনেক বড় শহর। তোমাদের অনেক লোক সেখানে থাকে। টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজে চাকরি করে।' একটু থেমে, শূন্যদৃষ্টিতে চারদিক দেখে নিয়ে, আবার শুরু করল, 'তোমার মত এক ইন্ডিয়ানকে ক'মাস আগে ম্যানচেস্টারে পৌঁছে দিয়েছিলাম। তার অবশ্য শিখের মত দাড়ি ও ইহুদির মত গুল টুপি ছিল। সে নতুন বিলেতে এসেছে বলে মনে হয়েছিল। ইংরেজি ভাষা তেমন বুঝত না। অনেক কষ্ট করে বুঝিয়ে বলেছিলাম যে, পঞ্চাশ পাউন্ড লাগবে। সে রাজি হলে তার দেওয়া ঠিকানায় উপস্থিত হতেই দেখি, অনেক লোক তার অপেক্ষা করছে। তার অভ্যর্থনা-উপলক্ষে যেন মেলা বসেছিল। ভাড়ার টাকা চাইতে শুরু হয় হৈচৈ। কয়েকজন একসঙ্গে পঞ্চাশ পাউন্ড দিতে উদ্যত হয়। আগন্তুককে আপ্যায়ন করার কী যে আগ্রহ! মনে মনে ভেবেছিলাম যে, এত লোক এক বাসায় কেমন করে থাকে?'

দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, 'না ইয়াংম্যান, তোমার কথা ঠিক না। লোকটি হয়ত পীর ছিল, ফলে তার দর্শন-ইচ্ছুক লোকের অভাব পড়েনি। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে বিভিন্ন বাসা থেকে লোকজন এসে এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল।'

'যাক, আর কথা নয়। এখন তোমাকে ম্যানচেস্টারগামী ট্রেনে তুলে দিলেই আমার কর্তব্য শেষ হয়। আমি বেশ কথা বলি, তাই না? আমার স্ত্রীও তা-ই বলে।'

স্টেশনের ভিতর গিয়ে দেখলাম, করাচির রেলস্টেশনের চেয়ে এখানে উন্নত মানের বিলিব্যবস্থা। ম্যানচেস্টারগামী ট্রেনটি ষোল-নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে, দশ মিনিট পর ছাড়বে। ব্যাগ হাতে নিয়ে ড্রাইভারের নির্দেশ মত একটি কামরায় ঢুকলাম। করাচির ইন্টারসিটি ট্রেনের মতই মনে হচ্ছে, এক-কামরা থেকে অন্য-কামরায় যাওয়ার সুব্যবস্থাও আছে, সিটগুলি আরামদায়ক। ড্রাইভার আমার পাশে বসে ধীরেআস্তে বলল, 'টিকেটের সঙ্গে ভাঙতিগুলি রেখে দাও। ম্যানচেস্টারে নেমে ট্যাক্সি করে তোমাকে হাইড যেতে হবে, তখন খুচরো পয়সাগুলি কাজে আসবে।'

পেন্স, শিলিং এর আগে কখনও স্বচক্ষে দেখিনি। মনে মনে হিশেব মিলিয়ে বুঝে নিলাম, সে আমাকে ঠকায়নি, বরং কমই রেখেছে। হাতের মধ্যে ভাঙতিগুলি ঝক্‌ঝক্‌ করতে লাগল। ড্রাইভার সিট ছেড়ে উঠে দঁড়িয়ে আমার দিকে হাত বাড়াতেই আমি দু'হাতে তার ডান-হাতটিকে কাবু করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার পাঁচাটি আঙুল আমার দশাঙুলের মধ্যে আটকিয়ে রাখতে পারছি না! এক-একটা আঙুল যেন আমার দুটোর সমান, তার হাত ও আঙুলের ত্বক বাঙরির মত ফাটাফাটা।

ইঞ্জিন সংযোগ করতেই রেলগাড়িটি সজীব হয়ে উঠল, এমনি ট্যাক্সি ড্রাইভারটি খুশি হয়ে শুভযাত্রা কামনা করে ট্রেন থেকে নেমে বন্ধুর মত হাত উঁচিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাল, এ-লক্ষ করে আমার সামনের আসনে বসা গোরালোকটি ঘোরচোখে আমাকে একবার দেখে নিল। কী আশ্চর্য তার চোখ! রোগ্ন চোখে এক অদ্ভুতদৃষ্টি; চোখগুলি ছোট কী বড়, টানা কী গোল ঠিক বোঝা গেল না, মনে হচ্ছে সে চোখে অন্ধকার প্রবেশ করতে ভয় পাবে। তার দৃষ্টি অনুসরণ না করেই আমার নবলব্ধ কিন্তু ছেড়ে যাওয়া ড্রাইভার বন্ধুর কথা ভাবতে বসলাম, সবদিক বিবেচনা করলে লোকটিকে ভালোই বলতে হয়। বাইর থেকে আমরা ইংরেজ-জাতিকে যতই মন্দ মনে করি না কেন, সব্বাই ত আর একরকম না, ভালোমন্দ নিয়েই এক-একটি জাতির সৃষ্টি। ইংরেজ আমলে মুখবুজে যত দুঃখ আমাদের সহ্য করতে হয়েছে তা যদি এ-লোকগুলি জানত তবে হয়ত ভিনদেশীর প্রতি এত ঘৃণা সঞ্চিত হত না এদের মনোজগতে। ড্রাইভারের ব্যবহার একটি শুভলক্ষণ বলে আমার মনে হচ্ছে, পরক্ষণে মনে হল, ধুত্তোর চাই! এসব ওমেনটমেন, লক্ষণটক্ষণ আমি বিশ্বাস করি না। শুভ-অশুভ লক্ষণ নিয়ে ভেবে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই, এসব কুসংস্কার। কুসংস্কারই ত দায়ী আমাদের অধোগতির জন্যে। মানুষের মন দুর্বল বলেই সহজে কুসংস্কারে আকৃষ্ট হয়; আর বাঙালি সমাজেই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কুসংস্কার, কুসংস্কারের অণুর পরে অণু জমে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের জগৎ আর পৃথিবীর বায়ু-জল-মাটি। আমরা বিশ্বাস করতে পারি না, আমাদের ধারণাশক্তির বাইরেও যে বিরাজ করছে অবাধ-অগাধ জ্ঞানের জগৎ, তাই আমরা আজ বিশ্বদরবারে কোণঠাসা, অপাঙ্‌ক্তেয়, আতরাফ, অস্পৃশ্য হরিজন; কাজেই সর্বপ্রকার কুসংস্কার সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য।

আড়চোখে আরেকবার দেখে নিলাম সামনে বসা গোরালোকটিকে, তার মুখে যেন কতকগুলি যন্ত্রণার ছায়া স্বগর্বে আলপনা এঁকে চলেছে, কোনওটিই স্পষ্ট নয়, ট্রেনের ভিতরের তরল আলোছায়ায় তার মুখটি কোনওরকম জীবন্ত থাকার চেষ্টা করছে শুধু; এরসঙ্গে বরফভেজা শীত যেন লুকচোরি খেলছে তার গলায়, ফলে মুখের প্রতিটি রেখাতে অন্ধকার ও আলো আর আলো-অন্ধারের নিষ্ঠুরতা স্বগর্বে আত্মপ্রকাশ করছে, যেন বেদনা-ব্যর্থতা-যন্ত্রণার চন্দ্রবিন্দুতে পৃথিবীটির নিশ্চিত প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। আমি ক্ষুধায়, পিপাসায় কাতর, না অন্যকোনও যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু– নিজেই জানি না, তবে এটুকু জানি সামনে সুদীর্ঘ পথ।

ট্রেনের বেগ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বিলেতি অন্ধকারে ইঞ্জিনটি একটানা আর্তনাদ করে যাচ্ছে। বেমানান যন্ত্রের যান্ত্রিক-কর্কশ শব্দ থেকে চেতনাকে সজাগ করতেই গোরার দিক থেকে চোখ সরিয়ে দৃষ্টি স্থাপন করলাম বাইরে, কিন্তু আমার মগজ থেকে ড্রাইভারের সঙ্গে ঘটে-যাওয়া ঘটনার আকস্মিকতার বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারছি না; অনিবার্যভাবেই কিছু পরিণতিজনিত পরিবর্তন ঘটতে থাকে আমার অন্তরে, চমকে উঠল মন, সমস্ত চৈতন্য যেন নড়তে থাকে– একে যদি আমার বিলেতবাসের শুরুতে ঘটে-যাওয়া ঘটনা বলে শুভজ্ঞানে গ্রহণ করি তাহলে একটি দ্বিধা মনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এসে ভিড় জমায়, কী করে এর নিষ্পত্তি করি! ড্রাইভারের সঙ্গে মিথ্যা দিয়ে আমার বিলেতবাস শুরু করেছি, মিথ্যা বলেছি পাউন্ডের ব্যাপারে, তার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছি অন্তরে, অর্থাৎ অন্তরে উদ্দীপ্ত-বিভাস্বর মিথ্যাকে আশ্রয় দিয়ে শুরু করেছি আমার পরদেশে পরবাসীর জীবন। তওবা করলে সব কলুষ না কী ক্ষমা হয়ে যায়, না, তা কী করে হয়? আমি আমার কথা বলছি। স্রষ্টার কাছে অশাস্ত্রীয় কাজ করলে সে-পাপ ক্ষমা করার বা অসহিষ্ণু হওয়ার

দায়িত্ব তাঁর, কিন্তু অন্যায়-অপরাধ যখন করলাম বিবেকের বিরুদ্ধে তখন বিবেককে জাগিয়ে তোলার মধ্যেই ত থাকে সহিষ্ণুতা। স্রষ্টা সে-অপরাধকে অবসান করলে চলবে কেন? তাঁর বিরুদ্ধে ত কোনও অপরাধ করিনি। আমি একজন মানুষের ক্ষতি করেছি, সে-ক্ষতি পূরণ না-করে স্রষ্টার কাছে শুধু ক্ষমা চেয়ে নিলেই হল! এ কেমন ব্যবস্থা? এতে কী সমাজে অপরাধ, অসঙ্গতির প্রবণতা বৃদ্ধি পায় না? যদিও আশ্বাস পাওয়া গেছে, স্রষ্টা তাঁর ভক্তের সব অন্যায়-অপরাধ অবসান করে দেন সহজেই, সে-দুষ্কর্ম ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বা সমাজের প্রতিই হোক-না কেন; কিন্তু স্রষ্টার বিরুদ্ধে ত একমাত্র বেআইনি কাজ হচ্ছে ব্ল্যাসফেমি, তিনি তা-ই যখন কোনও অবস্থায়ই ক্ষমা করবেন না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন, একাধিকবার, তখন অন্যের বেলাতে কীভাবে ক্ষমা করার আশ্বাস দিলেন তা ভেবেই পাই না। সত্যসন্ধান যত করা হবে ব্যক্তিস্বাধীনতা তত বৃদ্ধি পাবে, তবে প্রথমে ব্যক্তিবিশেষ নিজেকে যাচাই-বাছাই করে সমাজে নিজের স্বাধীনতার স্থান প্রসারিত করে নিতে হবে। আমরা সত্যকে সে-মুহূর্তেই আবিষ্কার করতে পারব যখন মানুষ তার নিজ মন থেকে মিথ্যাভয়, মিথ্যালজ্জা দূর করতে পারবে।

আমার চিন্তাজাল ছিন্ন করে দুটো শব্দ কানে এসে প্রবেশ করল, 'টিকেট প্লিজ।' চিন্তাভাবনা টুটে গেল, চমকে উঠলাম, কিন্তু চমকে ওঠার কোনও কারণ নেই, তবু কেমন যেন বোকার মত তাকিয়ে রইলাম। গোরার পাশে আরও কতগুলি ছায়াছায়া মুখ, কোনওটাই স্পষ্ট নয়, এদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে টি.টি.ই. ভদ্রলোকটি, মাঝারি বয়স, অন্তত তার চোখমুখ তাই বলছে, স্মার্ট ইউনিফর্মে তাকে বেশ মানিয়েছে। আমার পকেট থেকে টিকেট বের করে দিতেই সে হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে তেরছাভাবে কোমরের কাছে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগটি থেকে একটি পাঞ্চ বের করে ছিদ্র করল, তারপর টিকেট প্রত্যর্পণের সময় চোখ ইশারায় ধন্যবাদ জানাল।

ট্রেন চলেছে একমনে– তার ভাষা আলাদা, ভাব আলাদা, গতি আলাদা, মেজাজ আলাদা; আশপাশের কোনও ঘটনার প্রতি তার একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই, দূরপাল্লার রেলগাড়ি কী না, ছোটছোট স্টেশনগুলিতে থামছে না; শুধু স্টেশনের কাছে এসেই শোঁ করে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, নিশ্বাসের সাহায্যে জানিয়ে দিচ্ছে– সে এখন একটি ছোট স্টেশন পাশ-কাটিয়ে যাবে, বেগবান ট্রেনসৃষ্ট চলমান হাওয়ার ধাক্কায় যাত্রীরা যদি নিজেকে সমালাতে না পেরে স্টেশনের দালানকোঠার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়– এ-ভাবনায় সে এ-ধরণের সতর্কতামূলক আওয়াজ তুলে। রেলগাড়ির ভিতর যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম– কেউ শুয়ে বই পড়ছে, কেউ-বা বসে বসে ঝিমুচ্ছে; আর তাদের কোটগুলি মাথার উপর রাখা ট্রেতে হাই তুলে ঘুমোচ্ছে। কাচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখলাম, দেশের মত খাবারের দোকানে উনুনের ধোঁয়া, বস্তিবাসীর জটলা মুখ, চাপাকলের সামনে বালতির লম্বা লাইন বা চাপাকলের আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন– কেউ দাঁত মাজছে, কেউ-বা তেল মাখছে, কেউ-বা গায়ে জল ঢালছে– এসব বিচিত্রদৃশ্যের পাত্তা নেই; শুধু আছে বর্ষার বৃষ্টিহীন পরিবেশে বিলেতি প্রকৃতির নীরবতা, মাঝেমধ্যে বিদ্যুচ্চমক, এরইসঙ্গে নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন দিগদিগন্ত, যার ভার সামলাতে না পেরে নুয়ে পড়েছে আকাশটি, বোরকা-ঢাকা প্রকৃতি যেন, সহজলভ্য হলে যদি তার সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়, সেই ভয়ে সে স্বকীয় সৌন্দর্যকে লুকিয়ে রাখার কী অপরূপ প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছে! রেল-লাইনের উভয় পাশে গাছগাছড়া, ঝোপঝাড়, বনজঙ্গল– শীতে সব কেমন যেন আড়ষ্ট, অধিকাংশ নুয়ে, এদের অস্তিত্বই আমাকে অবাক করে দেয়! রিক্ততার মাঝেও যে-সৌন্দর্য, যে-আকুলতা এ-যেন আমাকে এক নতুনবার্তা বয়ে এনে দিচ্ছে, তবে এর অর্থ খুঁজে বের করার মত ধৈর্য্য আর সময় আমার নেই, আমি বিলেতি প্রকৃতির সত্য-সন্ধানে ব্যস্ত। আমার ধারণা ছিল, বিলেতের মাটি সহজে চোখে পড়বে না, চারদিকে শুধু থাকবে দালান আর দালান– দশতলা, বিশতলা; এদের ঠেসাঠেসিতে সারা জমি থাকবে ভরপুর। কিন্তু এ কী খেলা! খোলা মাঠ, সুদূরপ্রসারী। ইংরেজের মধ্যেও কী এমন লোক আছে যারা কৃষিকাজ করে? কৃষক ত নীচুলোক! আমাদের দেশে আশরাফশ্রেণীর মুসলমান ও কুলীনশ্রেণীর বৈদিক হিন্দু অনাহারী হলেও হালচাষ করে না, ইংল্যান্ডে ত কৃষকের মত নীচুলোক থাকার কথা নয়, যখন তাদের দাসানুদাস ভারতবর্ষের তথাকথিত অভিজাতশ্রেণীর মধ্যেই নেই, তবে কী অর্ধেক বিশ্ব একাধিক শতাব্দী ধরে শাসনশোষণকারী বিস্ময়জাগ্রত ইংরেজ-জাতি তারাও তাদের স্বদেশে স্বজাতীয় শূদ্রের অলঙ্ঘ্য প্রথার প্রবর্তন করেছে, না, অন্যদেশ থেকে লোকজন এনে এহেন নীচু কাজ করাচ্ছে? সিলেট অঞ্চলের লন্ডনিরা ত কোনওদিন এমন কথা বলেননি, শুধু সতর্ক করেছিলেন, 'মেয়েপুরুষের আকর্ষণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলতে হয়।' করাচি আসার দু'দিন আগেও মজমিল আলী নামের এক পুরোনো লন্ডনি,

আমাদের বাড়িতে বসে বলেছিলেন, 'সাবধানে থাকবেন, বাসে-ট্রেনে চলার সময় মেয়েরা এমনি এমনি এসে সোজা কোলে বসে পড়ে। মেয়ে ত নয় রূপসাব, যেন ডানাকাটা পরী।' নিজ কানে কথাগুলি শুনে আমার স্ত্রী সে-রাতে বালিশ ভিজিয়ে ছিল অশ্রুতে। আমাকে অবশ্য অনেক বেগ পেতে হয়েছিল ওকে সান্ত্বনা দিতে, যদিও মজমিল আলীর কথাগুলি সম্পূর্ণভাবে সত্য ছিল না।

রাগবি-জংশনে রেলগাড়িটি থামল, একটি নারীকণ্ঠে প্রকাশ পেল, 'যেসব যাত্রী কভেন্ট্রি, বার্মিংহাম, উলভারহ্যামটনে যেতে ইচ্ছুক তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এই স্টেশনে ট্রেন বদলি করার জন্য।' লোক ওঠানামা করছে স্বাভাবিকভাবেই– দৌড়াদৌড়ি, ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি নেই; 'চা গরম', 'পান সিগারেট' বলে হাঁক ছাড়ছে না কেউ। রেলগাড়িটি ছেড়ে দেবে এমন সময় একটি যুবতী– বর্ণ গৌর, মাথার চুল এলোমেলো, নাক চিকনলম্বা, দেহ শক্তশীর্ণ, হাতের আঙুলগুলি দীর্ঘসরু, চোখ ভরাভরা– লাফ দিয়ে ট্রেনের কামরায় উঠে, ডানে-বাঁয়ে একবার তাকিয়ে, দ্রুতপায়ে পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমার দিকে স্থির দৃষ্টি স্থাপন করে, মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আমি কী এখানে বসতে পারি?' অকস্মাৎ সামনে এসে দাঁড়ানো একটি স্ফুরিত আভায় ঝলসে ওঠা নারীকে দেখে আমার ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত কণ্ঠ কাঁপতে লাগল, মনও জলে-ডোবা পাটাতনের মত ভাসতে লাগল; এই ভেসে থাকা মন নিয়ে ভাবলাম, সে হয়ত এই সিটটি ছাড়া আর কোনও স্থানের সন্ধান পায়নি, তাই এখানে এসে হাজির হয়েছে। হঠাৎ আমার কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'অবশ্যই।'

সে আধখানি হাসি ও পুরো একটা ধন্যবাদ দিয়ে পাশে বসে তার হ্যান্ডব্যাগ থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করল, সঙ্গে লাইটারও। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া ট্রেনের ছাদের দিকে ছুঁড়ে মেরে সে তার চোখ নিবদ্ধ করল হাতঘড়িতে। দেখে নিচ্ছে ক-টা বাজে, আমিও আড়চোখে দেখে নিলাম সময়টা, এগারোটা পনেরো। আমার ঘড়িতে তখনও চারটা পনেরো বাজছে, পাঁচ ঘণ্টা পিছিয়ে, করাচির টাইম। করাচির সঙ্গে লন্ডনের সময়ের ব্যবধান এমনি বাস্তব যে, তার সত্যতা নিয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ অকাট্য প্রমাণ যে, পৃথিবী সমতল নয়। দেশে থাকতে কত যুক্তি দিয়েও বোঝানো যায়নি হবিগঞ্জের এক মৌলানাকে যে, পৃথিবী গোলাকার, প্রায় কমলালেবুর মত। তিনি পালটা বলেছিলেন, 'আল্লাহ বলেছেন, আমি পৃথিবীকে কার্পেটের মত বিছিয়ে দিয়েছি।' যা যৌক্তিক তাই বাস্তব– দৃষ্টান্তটি কীকরম ভুল। না, ভুল নয়। প্রচলিত কুসংস্কারযুক্ত বিশ্বাসই অবাস্তব। মানুষ বিজ্ঞানের বিকাশের মাধ্যমে জ্ঞানাহরোণ করে কুসংস্কারমুক্ত সত্যকে অবিষ্কার করেছে। মিথ্যা-বিশ্বাসই করজোড়ে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সত্যসন্ধানের পথটির পানে। মৌলানা বলে যেতে লাগলেন, 'আল্লাহর বাণীর বিপক্ষে সমস্ত যুক্তিতর্কই অচল।' জ্ঞানসমৃদ্ধযুক্তি যেখানে অচল, সেখানে চলার সকল পথ বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। যেখানে স্রোতবিহীন বন্দর, সেখানে নোঙর-ফেলা জাহাজ ভিন্ন পণ্যদ্রব্য আদানপ্রদানের সুযোগ থাকে না। খুঁটিতে বাঁধা উটকে মুক্ত মরূদ্যানে বিচরণ করতে না দিলে, তাকে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে হবে বই কী! নদীতে স্রোত না থাকলে প্রথমে অনাব্যতা, পরে মোহানাতে পলি জমতে জমতে সমুদ্রের সঙ্গে নদীর যোগাযোগ বিনষ্ট হয়ে যায়; কালক্রমে মরা নদীর খ্যাতি লাভ করে।

ট্রেনের মৃদুমন্দ ঝাঁকুনিতে দোলনার শিশুর মত ঘুম আসা স্বাভাবিক; তার ওপর ক্লান্ত মন, শ্রান্ত মাথামগজ, স্নান নেই, আহার নেই, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অবসাদগ্রস্ত দেহ, অবসন্ন। ক্লান্ত শরীরেও আঁখিপাতে ঘুম আসতে চায় না। উদীয়মান সূর্যের মত মনের মধ্যে নানারকম ভবনা, পথ-চেয়ে-থাকা আকাঙ্ক্ষাগুলি, উথালপাথাল করছে। লন্ডন আসার স্বপ্নের সফলতায় মন পুলকিত, উদ্বেলিত। ভাবতে শুধুই আনন্দ লাগছে, কত যুগের কত কথা, নূতন নূতন সব কল্পনা; কিন্তু চোখের পাতায় যখন ভেসে উঠল, স্বদেশে লন্ডনিদের ঠাট কাণ্ডকারখানার ছবি, তখনই মনের মধ্যে একরকম ঘেন্না জন্ম নিল। একবার এক লন্ডনি তার গ্রামের বাজারে গিয়ে মাছের এমন দাম করে বসল, যা বাংলার সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না, তখন তাকে ঘেন্না না-করে পারা যায়নি। বাহাদুরি দেখানোই তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; অবশ্য ভিড় জমানো, নূতন পয়সায় কত বড় মাছ কত বেশি টাকায় খরিদ করা যায় তাও তার উদ্দেশ্য। যে-লোকটিকে নিয়ে এই গল্পটি, সে নিরন্তর দাঁড়িয়ে আছে। স্থির রুইগুলি শুয়ে আছে মাছের ডালায়, শিং-মাগুরগুলি আবদ্ধ-জলে ঘুরে মরছে, চিংড়িগুলি উড়ে বেড়াচ্ছে মাছের থালার একপাশে। নানা মাপের, নানা বয়সী, নানা রঙের অন্য মাছগুলি চিত হয়ে পড়ে আছে জেলের সামনে। সে-লোকটি ঠিকই দাঁড়িয়ে আছে রুই মাছের সামনে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, গভীর মনোযোগ দিয়ে রূপালী

আঁশ পরীক্ষানিরীক্ষা করছে আর বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছে কিছু একটা। যখন মাছের দামাদামি শুরু হয়েছে তখন ভিড় জমে উঠল। আরেকটুকু সময় এগিয়ে গেল। বাজার থেকে ছোট ছোট মাছগুলি আস্তেধীরে উধাও হতে লাগল। সে-লোকটি তবুও বিচলিত হল না। খানিকটা ক্লান্তি, খানিকটা উত্তেজনা মেশানো মাথায় ও চোখে আরেকবার দেখে নিল রুই মাছটি, মানুষের ভিড়টিও। মানুষ যেমন একা একা হাসে, স্মিত ও সুন্দর ভাবে, ঠিক তেমনি রূপালী মাছটিতে দেখতে দেখতে সে-লোকটি আরেকবার হেসে নিল, অদ্ভুত চাঞ্চল্যময় অসংখ্য অগুণিত শাদাকালো দাড়ি দুলিয়ে, ধানক্ষেতের সঙ্গে যেন আঁড়ি দিয়েছে দাড়িগুচ্ছ। হঠাৎ সে-লোকটি মাছ-বিক্রেতাকে বলল, 'মাছটা তুইল্লা দে।' ময়লা, ছেঁড়া, মোটো সুঁতোর আদমজী মিলের জেলের পরনের লুঙ্গি কেঁপে উঠল। তার খালি গায়ে রোদ আর ছায়া ষোলকটি খেলতে লাগল, তার চওড়া কাঁধে, পেটানো বুকে ও হাতের পেশীতেও। সে-লোকটির গবির গোবরো জেলেটিকে কেমন যেন লাগছে; ছেঁড়াফাটা চৈত্রমাঠের মত তার চামড়া আর চেয়ালভাঙা রুক্ষ মুখের ভাঁজে ভাঁজে তার ক্ষুধার আগুন যেন। সে-লোকটির পাশে টুকরি হাতে দাঁড়িয়ে আছে তার ভৃত্য; তাকেই বিরক্তি ভরা কণ্ঠে সে-লোকটি হুকুম দিল, 'টুকরিটা আগগুয়াইয়া দিতএ পারছ না!' জেলেটি আটকা পড়ে গেছে লন্ডনির রঙিনজালে। জেলের সমস্ত মন জুড়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য একরকম স্তব্ধতা রাজ্যত্ব করতে থাকে, উইপিং-ট্রির মত নুয়ে পড়েছে যেন তার অনুতপ্ত অপরাধী মন। লন্ডনি এখন শক্তিশালী, তার কাছে অন্যায় করা মহাপাপ, অন্যায়ও ন্যায় হয়ে যায় তার কাছে, টাকার গন্ধই আলাদা, দেহমন বিগড়ে দেয়, ন্যায়-অন্যায় বুঝে না, অন্যায়কে ন্যায় বলে চালিয়ে দেয়। জেলেটি কাঁচুমাচু করে বলল, 'টেকাগুইন লন্ডনিসাব?' সে-লোকটি ধমকের সুরে বলল, 'কাইল বাড়িত গিয়া আনিছ্।' ধমকের ধরণ দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল সাধারণ জনতা সকল। জেলে জনতার দিকে চোখ তুলেই একবার তাকিয়ে তার দৃষ্টি নামিয়ে নিল। একমাথা ঝাঁকড়া চুলের আড়ালে তার মুখখানা আমসরা হয়ে গেল। বুকের মধ্যে ধানকলের শব্দ ঘস্‌ঘস্ করে উঠতে লাগল। সবরকম আশাভরসা চড়চড় করে ভেঙে গেল। জেলের ঠোঁটে দুঃখ কাঁপছে, তবুও মিনতি ভরা কণ্ঠে বলল, 'আমরা গরিব মানুষ। মাছ বেইচ্চা পেট বাছাই।' নারাজ হয়ে ভেংচে উঠল সে-লোকটি, 'বকওয়াছ করিছ্ না, তরা বড় মিছা মাত মাতছ।' কথার ঢঙে, চারদিকে, থোকা থোকা জনরবের গড়াগড়ি যাচ্ছে। 'না লন্ডনি সাব্, আল্লার কছম। মাছ বেছিয়া মাজনের টেকা দিয়া যা আয় অইব এত্তাকি চাউল, লবন, মরিচ কিনিয়া বাড়িত যাইমু। চাউল না লইয়া গেলে ঘরগুষ্ঠি, হাবিগুষ্ঠি না খাইয়া মরব।' সঙ্গে সঙ্গে সে-লোকটি তার মানিব্যাগ থেকে কয়েকটি নূতন নোট বের করে গুণতে গুণতে বলল, 'তরা বড় দিগদারি দেছ।' তারপর আমজনতার দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করল, 'হাছানায়নিবা, তোমরা কিতা কউ।' অবশেষে অভিনয়ের ভঙ্গিতে 'এই নে' বলে বাঁ-হাতের সাহায্যে একটি নোট ছুঁড়ে দিল জেলের দিকে। লক্ষ্যচ্যুত হয়ে সেই নোটটি কাদামাটিতে পড়ে গেল, একেবারে জেলের পায়ের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে জেলের চোখে অভাবের জবাব মেঘ হয়ে নামল, তবুও মাথা নীচু করে নোটটি কুড়িয়ে নিতে নিতে কাঁচুমাঁচু হয়ে বলল, 'ইতায়ত খরিদঐ অইছে না। গরিবর মারউককানা সাব। ই-নোটত আপনার হাতর মইল। আরেক খান দেউক্কা।'

'আরেক খানা তরে পরে দিমু, খোশ-অইয়া।'

'আইজ ত বাচাউক্কা।'

তাচ্ছিল্যদৃষ্টিতে জেলেকে একবার দেখে নিয়ে জনতার ভিড় থেকে বেরিয়ে আসল সে-লোকটি। সে তার টাই টাইট করতে করতে রাজপুরুষের মত তৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল; তারপর কিছুটা পথ অতিক্রম করে, একটি দোকানের বারান্দায় পা রেখে, জনতার দিকে আবারও ফিরে তাকিয়ে মুচকি হাসি মুখে এনে জনতাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করল। একজন প্রৌঢ়লোক বেরিয়ে এলেন সেই দোকান থেকে। সে-লোকটির চোখ প্রৌঢ়লোকের ওপর পড়তেই বলল, 'গরিবর খাসলত অমলাকানই অয়। খুদায় খামাকা গরিব বানাইছন না।' তার দিকে প্রৌঢ়লোকটি নিস্পলকভাবে তাকালেন, যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে, তারপর বললেন, 'সাধুহাটির মিয়া বাড়ির রোজগারি না তুমি?' সে-লোকটি কোনও উত্তর দিল না। তার মুখ একমুহূর্তে শ্মশান হয়ে গেল, তার চোখে যেন চিতার আগুন জ্বলে উঠেছে। সে-লোকটি এলোপাথারি পা ফেলে দোকানে ঢুকে ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিল। প্রৌঢ়লোকটি 'থ' হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধীরেআস্তে তিনি সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বললেন, 'হায়-রে লন্ডনি! কত খেলা খেলাবি তুই!'